ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছে?

খান মুহাম্মদ (শিক্ষানবিস)

"ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, চিকো"-র নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে সম্পাদিত "Magic, Witchcraft and Religion" বইয়ে ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতের নৃবিজ্ঞান নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে রবার্ট এইচ লোভির (Robert H. Lowie) একটি প্রবন্ধ আছে যার নাম "Religion in Human Life"। এটা পড়ার পরই কিছু লেখার তাড়া অনুভব করলাম। এমন একটা সময়ে প্রবন্ধটি লেখা যখন ধর্মের নৃবিজ্ঞান কেবল প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিল এবং যখন সমাজের সাধারণ মানুষের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব এতো বেশি ছিল না। ১৯৬৩ সালকে অনেকটা এরকমই ধরে নেয়া যায়। সমসাময়িক নৃতাত্ত্বিক চিন্তাধারা এবং সময়ের পটভূমিতে লোভির প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের আগে লোভির জীবন এবং প্রবন্ধটিতে তিনি ঠিক কি কি বলেছেন তা পরিষ্কার করে নিতে চাই।

রবার্ট লোভির জন্ম ১৮৮৩ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে। জন্মের ১০ বছর পর সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটিতে চলে আসেন। তবে নিউ ইয়র্কের জার্মান পল্লীতে থাকার কারণে লোভিকে খুব ভিন্ন কোন সমাজের মাঝে পড়তে হয়নি। তার বাল্যকালের প্রতিবেশে ইহুদি চিন্তাধারার পাশাপাশি মুক্তচিন্তারও স্থান ছিল। এই প্রবন্ধেই লোভি বলেছেন, বাবা-মা ছোটকালে তাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা দেননি। তাই কোন নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি ছোটকাল থেকেই তার আগ্রহ গড়ে উঠেনি। ১৬ বছর বয়সে দর্শন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন এবং লক্ষ্য করেন আর্নস্ট হেকেল সহ সমসাময়িক দর্শনের মূল ধারার দার্শনিকদের মনোভাব সব ধর্মের প্রতিই বিরূপ। বয়স ২৫ হওয়া পর্যন্ত দার্শনিকদের এই মনোভাব কেবল দেখেই গেছেন। এরই মধ্যে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শুরু করেন এবং নৃবিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে উঠেন। নৃবিজ্ঞানকেই ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেন। বিভিন্ন বর্ণনামূলক গবেষণার মাধ্যমে নৃবিজ্ঞান সমৃদ্ধকরণে বিশেষ অবদান রাখেন।

রবার্ট লোভি ঠিক কি কারণে ধর্মে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তা অনুমান করা যায়। খ্রিস্টান মিশনারিদের মানসিক দৃঢ়তা এবং বিশুদ্ধ জীবনযাপনই তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। এরপর যখন মাঠ পর্যায়ে গবেষণার জন্য অ্যারিজোনা আর মন্টানায় গেলেন এবং সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের বিশাল প্রভাব লক্ষ্য করলেন তখনই বোধহয় আগ্রহটা পাকাপোক্ত হয়ে গেল। সমসাময়িক অনেক নৃবিজ্ঞানীর মত তিনিও মেনে নিলেন, মানুষের বাস্তব জীবনে ধর্মের প্রভাব এতো বেশি যে এ নিয়ে পরিপূর্ণ নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। লোভি যে কেবল ধর্মের নৃবিজ্ঞান নিয়েই কাজ করেছেন তা নয়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব তাকে বরাবরই বিস্মিত করছে। "Religion in Human Life" প্রবন্ধে সে দিকগুলোই ফুটে উঠেছে। প্রথমেই তিনি গবেষণার ধরণ বলে দিয়েছেন, অবশ্যই তা নৃতাত্ত্বিক। নৃতত্ত্বের মূলকথা হল, সবাইকে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। অন্যদের বুঝতে না পারার মূল কারণ যে পক্ষপাতিত্ব তাকেই সমূলে উৎপাটন করে নৃবিজ্ঞান। লোভি এই কাজ আরও সহজে করতে পেরেছেন। কারণ ছোটবেলা থেকে তার মধ্যে কোন ধর্মীয় সংস্কার গড়ে উঠেনি। এ কারণে তার অসুবিধা না হয়ে বরং আরও সুবিধা

হয়েছে, তিনি সবকিছু নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সমর্থ হয়েছেন। লোভির দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি বড় দিক হল, তিনি স্বয়ং বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীদের পক্ষ নিয়েও কথা বলেননি, বিজ্ঞানী হয়েও বিজ্ঞানকে ধর্মের সমতলে নামিয়ে এনেছেন।

লোভি লক্ষ্য করলেন, আদিম পৃথিবীতে এমন কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না যাদের কোন ধর্মীয় ধারণা বা বিশ্বাস ছিল না। যেহেতু এটা সর্বব্যাপী ও সুপ্রতিষ্ঠিত সেহেতু এর কোন না কোন গুরুত্ব অবশ্যই থাকবে। এই গুরুত্বের কথা বুঝতে পারলেন আফ্রিকার আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে শুরু করে খ্রিস্টান চার্চের ধর্মপ্রচারক সবার মধ্যে একটি সাধারণ চেতনার দিকে লক্ষ্য করে। চেতনাটি হল, "অন্যকে সাহায্য করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং নিজের চেয়ে অনেক বড় কোন সত্ত্বার প্রতি বিশ্বাস থেকে পাওয়া সাহস"। এভাবেই বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তথ্য জোগাড় শুরু করলেন তিনি। সবকিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলেন। তার কাছে এগুলো ছিল কেবল মানুষের বিশ্বাসের প্রতিফলন যা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক গবেষণার দাবী রাখে। এর পাশাপাশি ধর্মবিরুদ্ধতার দিকেও চোখ পড়লো তার। সে সময় ধর্মের প্রতি পণ্ডিতদের তিন ধরণের মনোভাব ছিল। প্রথমত, ধর্ম এক ধরণের কর্তৃপক্ষ যা বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা হরণ করে; দুই, বাধা নিষেধের প্রতীক; তিন, জনগণের আফিম। ভলতেয়ারের বিখ্যাত উক্তি থেকে প্রথম মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়, "প্রথম দুষ্কৃতিকারীটি যখন প্রথম বোকাকে ঠকিয়েছিল তখন থেকেই ধর্মের সূচনা।" আর শেষ মনোভাব যে মার্ক্সবাদ থেকে এসেছে তা না বললেও চলে। মার্ক্সের মতে ধর্ম হল পুঁজিবাদের হাতিয়ার যা দিয়ে তারা শোষণ প্রক্রিয়া চালু রাখে।

স্পষ্টতই বোঝা গেল, ধর্ম বুদ্ধিজীবী মহলে কতটা ভিত্তিহীন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এটাও সত্য যে, সাধারণ মানুষের কাছে তা কখনই গুরুত্ব হারায়নি। এক সময় চার্চের গুরুত্ব মানুষের কাছে কমে গিয়েছিল, কিন্তু ধর্মের শক্তি তখনও পুঞ্জিভূত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেকেই ধর্মকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন, মুক্তি ও নিরাপত্তার আশায়। এ থেকে বোঝা যায় ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ভাব মূলত উন্নতি ও প্রতিপত্তি থেকে আসে। মানুষ প্রভাবশালী ও ধনী হয়ে গেলে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা তার কাছে ফুরিয়ে যায়, অন্তত সে তা-ই মনে করে। এই অবজ্ঞা ভাব অনেক বিস্তৃত হয়েছে, যা দুটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়: এক, ধর্মের প্রতি অনেকেই নিবেদিত কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশই হতদরিদ্র; দুই, অন্যরা অর্থাৎ যারা স্বচ্ছল তারা ক্যাথলিক ধর্মকে পরোক্ষভাবে পালন করে, সন্তানকে ব্যাপ্টাইজ করলেও নিয়মিত ধর্ম পালন তাদের দ্বারা হয়ে উঠে না। প্রোটেস্ট্যান্ট সুইডেন বা ইভানজেলিক্যালদেরও অবস্থাও এমন। এভাবেই আধুনিক সভ্য জগৎ থেকে ধর্ম উধাও হতে বসেছে, আপাত দৃষ্টিতে অন্তত তা-ই মনে হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মাঝে কাজ করতে গিয়ে লোভি লক্ষ্য করলেন, অ্যামেরিকার আদিবাসী অর্থাৎ ইন্ডিয়ানদের অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম এখনও বিশাল প্রভাব বিস্তার করে আছে, আদিম মানুষের জীবনে যেমন ছিল অনেকটা তেমনই।

নিউজিল্যান্ডের মাউরি গোষ্ঠীর লোকেরা যে কোন কাজের শুরুতেই ঐশীবাণী পড়ে নেয়, এমনকি একটি নৌকা বানাতে গেলেও বা বানানোর পর তা প্রথমবারের মত পানিতে ভাসাতে গেলেও। উত্তর ব্রাজিলের আপিনাই গোষ্ঠীর লোকেরা প্রতিদিন সূর্যের সম্মানে সমবেত ধর্মীয় সঙ্গীত গায়। এই উদাহরণগুলো লোভি পরোক্ষভাবে দিয়েছেন। নিজের গবেষণা ক্ষেত্র তথা ক্রো ও হোপি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় একাগ্রতা তাকে প্রত্যক্ষভাবেই বিস্মিত করেছে, অবশ্য এই দুই গোষ্ঠীর আচারানুষ্ঠানের মাহাত্ম তার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঠেকেছে।

হোপিরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য অনেক সময় ব্যয় করে যা সময়ের অপচয় বলে মনে হতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে বছরের প্রতি তিন দিনে এক দিন তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে ব্যয় করে। কোন আচারানুষ্ঠান এক বার শুরু হলে তিন দিনের আগে থামতেই চায় না। সপ্তাহ বা মাস ব্যাপী অনুষ্ঠানও আছে। তাদের সবগুলো অনুষ্ঠানই বৃষ্টিকেন্দ্রিক। বিষয়টা খুব স্বাভাবিক। চাষের জমিতে সেচ দেয়ার মত কোন প্রযুক্তি না থাকায় কেবল বৃষ্টির উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়। এজন্যই বৃষ্টি নিয়ে এতো বন্দনা। তাই হোপিদের উপাসনাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায় না। সাধারণ একজন ব্যক্তি সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করছে, বিষয়টা এমন নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে তাদের প্রাত্যহিক জীবন।

ক্রো ইন্ডিয়ানরাও ধর্মের প্রতি খুব একনিষ্ঠ। এই দুই গোষ্ঠীই ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালনে অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করে, হোপিরা বোধহয় একটু বেশি। কিন্তু এদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। হোপিদের কাছে উপাসনার ভাবগত দিক খুব একটা প্রাধান্য পায় না। কিন্তু ক্রো-দের বসবাস ভাবের জগতে। ক্রোদের অতিপ্রাকৃতের সাথে মুখোমুখী যোগাযোগ লোভিকে সর্বাধিক বিস্মিত করেছিল। তারা হরহামেশাই এমন যোগাযোগ স্থাপন করে। তাই ক্রো এবং হোপি-দের মধ্যে যে পার্থক্য তাকে একটি প্রতিষ্ঠিত চার্চ ও সাধারণ ইভানজেলিজ্‌মের মধ্যে পার্থক্যের সদৃশ বলে চালিয়ে দেয়া যায়।

আদিবাসীদের এই ধর্ম পালন আমাদেরকে আদিম মানুষের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আমরা বুঝতে পারি ধর্ম তাদের জীবনের কতটা অংশ জুড়ে ছিল। এটাই স্বাভাবিক, কারণ যারা ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের এছাড়া কোন উপায় নেই। ক্রো জনগোষ্ঠীর লোকেরা এটাকে ঐশ্বরিক যোগাযোগের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। লোভি বলেন,

> ক্রোদের জীবনের প্রতিটি কাজ ধর্ম অনুযায়ী সম্পাদিত হয় বললে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে, কিন্তু এটা সত্য যে তাদের জীবনের প্রতিটি হতাশা ও কষ্টের সাথে ব্যক্তিগত ঐশ্বরিক যোগাযোগ রূপে ধর্মের উপস্থিতি থাকে।

অর্থাৎ তাদের জীবনের যেখানেই হতাশা ও ব্যর্থতা সেখানেই ধর্ম। এই হতাশা ও ব্যর্থতাকে কিন্তু জীবনের অর্ধেক বলা যায়। তাহলে ধর্মকেও কি অর্ধেক বলতে হবে? না, ধর্ম তাদের জীবনে অর্ধেকেরও বেশি। তারা মনে করে, জীবনের সকল সফলতাই ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আসে। আর কেউ ব্যর্থ হলে ধরে নিতে হবে, তার কোন ঐশ্বরিক দূরদৃষ্টি নেই। এজন্য ব্যর্থ মানুষ মাত্রই সফল কারও কাছ থেকে কোন নিদর্শন নেয়। এই নিদর্শনের মাধ্যমে হয়তো কোন সফলতা আসে তার জীবনে। এভাবেই তার ঐশ্বরিক যোগাযোগের সূচনা ঘটে। ক্রো গোষ্ঠীর বৃদ্ধরা সবকিছু এভাবেই বর্ণনা করল লোভির কাছে। লোভির এক খ্রিস্টান বন্ধু তাকে এ সম্বন্ধে বলেছিল, "বৃদ্ধদের কাছ থেকে যখন এরকম কথা শোন তখন চোখ বন্ধ করে তোমাকে বিশ্বাস করে যেতে হবে।" আসলেই তো, এখানে সবকিছুই বিশ্বাসের। এর বাইরে কিছুই নেই। কিন্তু এভাবে বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হয়। তাই বিশ্বাসের জন্য কিছু যুক্তি দেয়া ভাল। অতিলৌকিক ঘটনা ঘটা বা তা বর্ণনার সময় এই লোকেরা যে সচেতন ছিল তার পেছনে অন্তত ৪টি যুক্তি আছে।

১। একজন সাদা মানুষের কাছে তারা কেন মিথ্যা বলবে? কারণ তারা তো জানেই, তাদের গল্প যত অবিশ্বাস্য হবে সাদা মানুষেরা তা ততই কম বিশ্বাস করবে।

২। তারা যে ধরণের দৃষ্টি অর্জন করে তা শুধুমাত্র হেঁয়ালির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তারা এরকম ঐশ্বরিক যোগাযোগের জন্য দুর্গম পাহাড়ের উপর চলে যায়। সেখানে চারদিন অবস্থান করে, নিজেকে কষ্ট দেয়। এটা কোন পুরাণ নয়, কারণ লোভি নিজেই এরকম ঘটনা দেখেছেন। নিছক হেঁয়ালির উপর এটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

৩। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, সফলতা অর্জনের আশায় সে নিজেই নিজের মধ্যে একটা স্বপ্ন বা হেঁয়ালির জন্ম দিয়েছে; তারপরও কথা থেকে যায়। কারণ, সেক্ষেত্রে ফিরে আসার পর তার সফলতার সম্ভাবনা থাকতো না, প্রশংসিত হওয়ার বদলে সে নিজের সম্মান হারাতো।

৪। অতিপ্রাকৃতের কাছ থেকে কোন পুরস্কার পেয়ে অনেকেই সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের উপর নতুন বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। যোগাযোগের সময় ঈশ্বর তাদেরকে একটি নিষেধাজ্ঞা দেন। এটা মেনে না চললে সে আবার ব্যর্থ হবে। লোভি এক বৃদ্ধকে দেখেছেন যে এ কারণে ঐশ্বরিক যোগাযোগের পর দিন থেকে কখনও ঘোড়ায় চরেনি।

সুতরাং এরকম দৃষ্টি অর্জন হেলা করার মত না। এই আচারানুষ্ঠান ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আর সমাজকে প্রভাবিত করে।

এবার বিশ্বের সাধারণ মানুষদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক যাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় এমনই ছিল। এই সমাজেও ব্যক্তিগত চিন্তাধারা সমাজকে প্রভাবিত করে। আর এখানেও ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপাদান হল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। নিরাপত্তা ও নির্বাণের আশায় অধিকাংশ মানুষই ধর্মকে পুষে রাখে। কিন্তু তাদের ধর্মানুভূতির প্রকাশ আদিবাসীদের মত অতো স্পষ্ট হয় না। সে হিসেবে ধর্ম সমাজের অন্যতম ঐক্য আনয়নকারী হিসেবে কাজ করে। অবশ্যই ধর্ম সমাজ একাঙ্গীকরণের একমাত্র চালিকা শক্তি না। সঙ্গীত, শিল্প বা বিজ্ঞানও সে ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু কে পালন করবে তা নির্ভর করে ঐ সমাজের মানুষ কার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার উপর। এটা ধ্রুব সত্য যে, বিজ্ঞান, শিল্প বা সঙ্গীতের সাথে মিশে যেতে পারে এমন মানুষ সমাজে বেশি নেই। সমাজের অধিকাংশ মানুষই এখন পর্যন্ত ধর্মের সাথে একাত্মতা পোষণ করতে পারে। এ ধরণের সমাজে একাঙ্গীকরণের দায়িত্ব ধর্ম ছাড়া আর কে-ই বা পালন করবে। লোভি বলেন,

> সাধারণ মানুষের জন্য সমাজ একাঙ্গীকরণের চালিকা শক্তি হিসেবে এখনও ধর্মের বিকল্প নেই। এই ধ্রুব সত্যটি কেবল ধর্মের অস্তিত্বই ঘোষণা করে না, একই সাথে এর সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে ফুটিয়ে তোলে।

এবার দেখা যাক ধর্মকে ঝেড়ে ফেলে সমাজ কতটা একীভূত হয়ে উঠতে পারে। এমন একটা সমাজের কল্পনা করতে হবে যেখানে ধর্মকে বিলুপ্ত করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নাৎসি জার্মানিই এক্ষেত্রে সর্বোত্তম উদাহরণ। হিটলার খ্রিস্টান হওয়ার কারণে ইহুদি বিদ্বেষী ছিলেন না। কারণ সভ্য খ্রিস্টান কখনও ইহুদি নিধনকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। তার এই চেতনার মূলে ছিল যুবক বয়স থেকে তিল তিল করে গড়ে উঠা চেতনা যা তাকে বলেছিল, ইহুদিরাই জার্মানদের সর্বশক্তিমান হয়ে উঠার পথে প্রধান অন্তরায়। আর জার্মানদের সর্বশক্তিমান হতে হবে এবং পুরো বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে জার্মানরা এ ধরণের চেতনা হিটলার পেয়েছিলেন ইউজেনিক্স থেকে। তিনি মনে করতেন জার্মানদের চেয়ে সভ্য ও উন্নত আর কেউ নেই। এভাবেই হলোকাস্টের সূচনা। হলোকাস্ট অবশ্যই ধর্মবিরোধী। খ্রিস্টান চার্চ হলোকাস্ট বা হিটলারের কুশাসন মেনে নিতে পারেনি। হিটলার নিজের চিন্তাধারার বিরোধী কোন পক্ষকেই টিকিয়ে রাখতে চাননি যার মধ্যে ধর্মপ্রচারকরাও পড়তেন। সংগঠিত ধর্মকে উপড়ে ফেলে নিজের ইউজেনিক্স কেন্দ্রিক নাৎসিবাদকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার লক্ষ্য। তিনি "ইয়ুথ গ্রপ" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যরা উদ্দেশ্য ছিল, এমন যুব সমাজ গড়ে তোলা যাদের মধ্যে প্রথাগত ধর্মের প্রতি আনুগত্য থাকবে না। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নেও এ ধরণের ধর্মহীন শিক্ষা প্রচলিত ছিল। কোন গ্রামের মানুষকে ধর্ম পালন থেকে বিরত রাখার একটি মোক্ষম উপায় হল, সেখান থেকে একটি শিশুকে ছিনিয়ে নেয়া এবং তাদেরকে বলে দেয়া, কেউ যদি ধর্ম পালন করে বা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে সাহায্য করে তাহলে শিশুটিকে মেরে ফেলা হবে। জার্মানির মত খ্রিস্টান রাষ্ট্রে হিটলার কিভাবে এই নীতি প্রয়োগ করেছিলেন তা বেশ দুর্বোধ্য। এভাবে সমাজ থেকে ধর্ম সরিয়ে নিলে কি হতে পারে তা লোভির ভাষায় বললে দাড়ায়:

> ধর্ম উধাও হওয়ার সাথে সাথে সমাজ থেকে নৈতিক মানদণ্ডও উধাও হয়ে যায়। সেই সমাজে যে কেবল ধর্ম থাকে না তা নয়, কোন সাধারণ বাধা সৃষ্টিকারী নীতিও থাকে না। কোন জাতি ধর্ম বাদ দিয়ে নৈতিকতা ধরে রাখতে পারবে কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হিটলার কতটা ধর্মবিরোধী ছিলেন তা নিয়ে বিস্তারিত চিন্তা করার অবকাশ আছে। কিন্তু এটা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্যাতিত, নিপীড়িত এবং যুদ্ধে বিধ্বস্ত সৈনিকরা ধর্মের দারস্থ হতে বাধ্য হত। জার্মানি-অস্ট্রিয়া-পোল্যান্ড অঞ্চলের খ্রিস্টান চার্চও হিটলারের নীতিকে মেনে নিতে পারেনি। "দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক" সিনেমাতে চার্চের মাদার নাৎসি বাহিনীর হাত থেকে "মারিয়া ফন ট্র্যাপ" পরিবারকে পালাতে যেভাবে

সাহায্য করেছিলেন বাস্তবতা তেমনই ছিল কি-না জানি না, তবে সিনেমা তো বাস্তবতারই প্রতিফলন। নাৎসিদের ধর্মনাশ নিয়ে লোভি যা বলেছেন তা বাস্তবতার খুব কাছাকাছি।

রবার্ট লোভি এরপর ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। গত ১০০ বছর ধরে এই সংঘাত ক্রমেই জোড়ালো হচ্ছে। তবে লোভি মনে করেন, এই সংঘাত মাত্র কয়েকটি বিষয় নিয়ে, বিজ্ঞানের সামগ্রিক শিক্ষার কথা চিন্তা করলে যা খুবই নগণ্য। তাই "স্বতন্ত্র বলয়" (এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ) মেনে নিলেই বিষয়টা চুকে যায়। স্বতন্ত্র বলয়ে প্রথমে বলা হয়েছে ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে আলোচিত হবে, একে অন্যের পরিমণ্ডলে হস্তক্ষেপ করবে না। পাশাপাশি কে কোন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবে তাও বলে দিয়েছিলেন স্বতন্ত্র বলয়ের প্রবক্তা স্টিফেন জে গুল্ড। এই কাজটা না করলে সম্ভবত তিনি আরও কম সমালোচিত হতেন। কেবল স্বতন্ত্র বলয়ের বিষয়টি মেনে নিলেই সব সংঘাত চুকে যায়। আর কে কোন বলয়ে থাকবে তা সমাধান করাও কঠিন নয়। কারণ বলয় ইতোমধ্যে ঠিক হয়েই আছে। তাই বর্তমানে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সংঘর্ষ নৈতিকতার মানদণ্ড নিয়ে। তাই সব ঝেড়ে ফেলে এই একটি বিষয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। লোভির মতে, বিজ্ঞান কখনই নৈতিকতা ঠিক করে দিতে পারে না। নিজের মত করে কিছু বলার আগে লোভি কি বলেছেন তা-ই বলে নেয়া যাক।

লোভি প্রথমেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অস্থিতিশীলতার কথা বলেছেন। তার মতে বিজ্ঞানের সব তত্ত্বকেই অনুকল্প (হাইপোথিসিস) বলা যায়। কারণ সবগুলোই অপেক্ষাকৃত ভাল কোন অনুকল্প দিয়ে প্রতিস্থাপিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি মানুষের আরেকটি ভুল ধারণার উল্লেখ করেছেন। অনেকেই মনে করে, বিজ্ঞান সমাজ এবং অর্থনীতির ঊর্ধ্বে। কিন্তু লোভি বলেন, বিজ্ঞানীরা কোন আইভরি টাওয়ারে বাস করেন না, তারা এই সমাজেরই মানুষ, এই সমাজের অর্থনীতিই তাদের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। তাই সমাজ ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিবিঢ় সম্পর্ক আছে। বিজ্ঞানীদেরও একটা সমাজ আছে যা অনেক সময় অপেক্ষাকৃত ভাল তত্ত্বের স্বীকৃতি দেয় না। যেমন উইলিয়াম হার্ভে যখন রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছিলেন তখন, বিজ্ঞানী মহল তাকে হাতুড়ে ডাক্তার আখ্যা দিয়েছিল। এর পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অনেক সময়ই ভুল ধারণা বিকশিত হয়ে উঠে, তবে অবশ্যই ভুল শোধরানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানই সবচেয়ে এক্সপার্ট। লোভির এই কথাগুলোকে বিজ্ঞানের জন্য খুব কটুর বলে ধরে না নিলেও চলে। কারণ তিনি এগুলো বলেছেন বিজ্ঞানকে ধর্মের সমতলে নামিয়ে আনার জন্যই। মূল কথা বলেছেন এর ঠিক পরেই।

বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই বোধহয় ঠিক কথা বলছে, কিন্তু তারা যে ব্যক্তিদের নিয়ে বলছে বা যে সমস্যার সমাধান করছে সে ব্যক্তি ও সমস্যাগুলোই আসলে ভিন্ন। একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারও যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে ধর্মের দারস্থ হয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু কেউ সাইকোসোমাটিক হলে আবার বিজ্ঞানের কাছে গিয়েও লাভ নেই। সাইকোসোমাটিক বলতে হতাশা থেকে উদ্ভূত একটি সমস্যাকে বোঝায়। লোভি তার এক ভাইয়ের উদাহরণ টেনে বুঝিয়ে দেন, কিভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস তাকে সুস্থ করে তুলেছিল। এ বিষয়ে তার শেষ কথা ছিল:

> সাধারণ মানুষ কেবল এমন একটি সমাধান চায় যা সত্যিকার অর্থেই কাজে দেবে। সেই সমাধান তৈরী করতে গিয়ে গণনায় কি পরিমাণ ভুল হয়েছে বা তা আদৌ কার্যকরী কি-না এ নিয়ে তারা বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামায় না।

অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম এমন একটি কার্যকরী সমাধান দিতে পারে।

এসব কারণেই লোভি স্পষ্ট করে বলে দেন, একজন সাধারণ মানুষ কখনই ধর্মের বদলে বিজ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক ডোরিস লেসিং সত্যমুখী দর্শনের জয়গান গেয়েছেন। তার মতে,

> সত্যকে অর্জন না করে আজীবন তার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়াই সর্বোত্তম।

কিন্তু লোভি মনে করেন, সাধারণ মানুষের কাছে লেসিংয়ের এই দর্শনের কোন গুরুত্ব নেই। তাই সাধারণ মানুষ সত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, তার জন্য সংগ্রাম করতে চায় না। সে এ ধরণের সত্যের কাছ থেকে শান্তি, নিরাপত্তা ও আয়েশ চায় যা বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে কখনই আসতে পারে না। কারণ বিজ্ঞান নিজেই প্রচণ্ড গতিশীল, প্রগতিশীল ও বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। আর্নস্ট মাখ বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

> বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ দর্শন হল বিশ্বের একটি অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে চলা এবং এই বয়ে চলাকে আপাত সম্পূর্ণ কিন্তু অপর্যাপ্ত বিশ্ব দৃষ্টির (ধর্ম) চেয়ে উত্তম বলে আখ্যায়িত করা।

বিজ্ঞানের প্রকৃত দর্শন এটাই। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই বিজ্ঞানী নন। তাই তাদের পক্ষে এই দর্শন মেনে চলা সম্ভব না। তাদের পক্ষে কি সম্ভব তার একটি সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায় গ্যোটের কবিতাতে:

> Wer Wissenschaft und kunst besitzt
> Hat auch Religion;
> Wer jene beiden nicht besitzt,
> Der habe Religion.
>
> যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈসর্গিক উদ্দেশ্যকে তাড়া করার কাজে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছে
> তার উৎসাহই তার ধর্ম হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এই তাড়া করার কাজে জড়াতে না চাইলে
প্রথাগত ধর্মের উপর নির্ভর করে চলাই উত্তম।

এভাবে প্রবন্ধের শেষ প্রান্তে চলে আসেন লোভি। এ পর্যায়ে এসে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, বিজ্ঞান মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে না। ধর্মের পক্ষেই কেবল চূড়ান্ত নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব। সবশেষে বলেন:

যতদিন প্রকৃতির উপর যুক্তিযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও মানুষের জৈব-মনোবৈজ্ঞানিক চালিকাশক্তির মধ্যে ব্যবধান থাকবে ততদিন বিশ্বাসেরও স্থান থাকবে। এই বিশ্বাস শুধু আয়েশই দেয় না সাথে নিরাপত্তা জোগায়; সম্ভাব্যতার বদলে নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাই বলা যায়, ধর্ম ও বিজ্ঞান মানুষের জীবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের দুটি কাজ করে এবং এই দুয়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

এতটুকু জানার পর ধর্ম নিয়ে চূড়ান্ত কোন মন্তব্য করার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছে?

এই উত্তর দেয়ার আগে জানতে হবে কার বা কিসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। যদি কোন মানুষের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয় তাহলে আমি প্রথমত গ্যোটের কবিতার সাথে একমত। অর্থাৎ যারা প্রথাগত ধর্মের বাইরে অন্য কিছুকে (বিজ্ঞান বা শিল্প-সাহিত্য) সমাজে বসবাসের জন্য তার চালিকাশক্তি হিসেবে খুঁজে পেয়েছে তার জন্য সেটাই সর্বোত্তম ধর্ম। কিন্তু যে সেটা খুঁজে পায়নি তার জন্য প্রথাগত ধর্ম মেনে চলাই উত্তম। কিন্তু, এই প্রথাগত ধর্মের কথা বললে তার মধ্যে গোঁড়ামিও এসে যায় যা অন্য ধর্মের সাথে বিরোধের সৃষ্টি করে। এই গোঁড়ামি এড়ানোর জন্য ডোরিস লেসিংয়ের মত আমিও বলব, সত্য বলে কোন কিছুকে ইচ্ছাকৃতভাবে মেনে নেয়ার চেয়ে বরং সত্যের অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া ভাল। কারণ সত্যানুসন্ধানী কোন ব্যক্তির পক্ষে গোঁড়া হওয়া সম্ভব নয়। সে, সমাজে স্থান করে নেয়া এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই কেবল ধর্ম পালন করবে।

এবার সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা যায়। রবার্ট লোভি তো বলেই দিয়েছেন, মানুষের জীবনে যেহেতু এখনও ধর্মের স্থান আছে সেহেতু সমাজেও এর প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সেটা ১৯৬৩ সালের কথা। তখনও বিজ্ঞান এতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আর তখন বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত প্রযুক্তির ব্যবহারও ছিল সীমিত। গত ৪০ বছরে সমাজে বিজ্ঞানের প্রভাব ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে আর ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। ধর্মের প্রভাব হ্রাসের আরেকটি কারণ শিল্প ও সাহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি। প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণেই শিল্পের এই প্রসার ঘটেছে যার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ চলচ্চিত্র। এই পরিস্থিতিতে কেউ কি বলতে পারে, সমাজ জীবনে ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই।

এর উত্তর বিভিন্ন সমাজের জন্য বিভিন্ন রকম। কোন সমাজ ধর্মহীনতার দিকে এগোচ্ছে আর কোনটি এগোচ্ছে না তাও গবেষণার বিষয়। এই গবেষণার জন্য নৃবিজ্ঞানের বিকল্প নেই।

পরিশেষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা আসে। সেক্যুলারিজ্‌ম তথা ধর্মনিরপেক্ষতা বা ইহজাগতিকতা বিকশিত হওয়ার পর আমরা ধরেই নিতে পারি, রাষ্ট্রে ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সেক্যুলারিজ্‌ম অর্থই হল, রাষ্ট্র ধর্মহীন থাকবে এবং ব্যক্তি বা সমাজ ধার্মিক না ধর্মহীন তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তাই বলা যায়, এই যুগে রাষ্ট্র চালনার একমাত্র সমাধান সেক্যুলারিজ্‌ম।

সেক্যুলারিজ্‌ম মেনে নিয়ে তো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজমান প্রায় সব সমস্যার সমাধানই করা গেল। কিন্তু বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সংঘাতের কি হবে? আগেই বলেছি, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত সমাধানের প্রাথমিক উপায় "স্বতন্ত্র বলয়"। কিন্তু এই প্রাথমিক সমাধান বর্তমান যুগের সংশয়বাদী ও নাস্তিকদের মতের বিরুদ্ধে যায়। তাদের মতে, ধর্ম নৈতিকতার মানদণ্ড হতে পারে না। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের একমাত্র সংঘাত হল, বিজ্ঞান ধর্মকে নৈতিকতার মানদণ্ড হতে দেবে কি-না। এরও সমাধান আছে। তা হল নৈতিকতার অন্য কোন মানদণ্ড তৈরী করা এবং তার ভিত্তিতে সমাজকে গড়ে তোলা। সেই প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত ভালভাবে শুরু হয়নি। হলে তা দর্শন দিয়েই হবে। স্পিনোজার নীতিশাস্ত্র হয়তো আবার ফিরে আসবে। কিংবা সেই নীতিশাস্ত্রেরই কোন আধুনিক রূপ ধর্মের স্থান করে নেবে। তখন কি ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে? এটা আমি বলতে পারব না। বরং পাল্টা প্রশ্ন করতে পারব, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে যাবার মত? আমরা এক সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে আছি। কারণ আমাদেরকে এমন একটি প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে। আমি এখন পর্যন্ত এর জবাব খোঁজার চেষ্টা করিনি। তাই সরাসরি কোন উত্তর দিতে চাই না। অভিজিৎ রায়ের মত বলতে চাই, "Let the data decide"।

* সূত্রঃ Religion in Human Life - Robert H. Lowie; from "Magic Witchcraft and Religion", California State University, Chico.

সম্পাদকের নোট: বইটির সম্পাদক হিসেবে কিছু ব্যক্তিগত মতামত যোগ করা যাক। লেখাটি তথ্য সমৃদ্ধ। আমরা আজকে যে বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশ করেছি সেখানে, ধর্ম-এর টিকে থাকার পেছনে 'শোষক শ্রেনীর হাতিয়ার' বা এ ধরণের রাজনৈতিক শ্লোগান না আউরে বরং এতদিন ধরে টিকে থাকার পেছনে কোন নৃতাত্ত্বিক কিংবা জীববৈজ্ঞানিক কারণ আছে কিনা তা খূজে দেখা দরকার। নৃবিজ্ঞানের আলোয় উপরের প্রবন্ধে তো আলোচনা করা হয়েছেই, সেই সাথে সামাজিক জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো জানাও এ মুহূর্তে জরুরী। বিবর্তনবাদের দৃষ্টিতে দেখলে সেটাই এই মুহূর্তে সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক পন্থা। এমন হতেই পারে 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা মানব জাতির বেঁচে থাকার পেছনে হয়তো কোন বাড়তি উপাদান যোগ করেছিল একটা সময়। মানুষ তো আদিমকাল থেকে বহু সংঘাত, মারামারি এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে। একটা সময় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করাটা ছিল মানব জাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বড় ফ্যাক্টর। যে গোত্রে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল যে যোদ্ধারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেলে পরলোকে গিয়ে পাবে অফুরন্ত সুখ, সাচ্ছন্দ্য, হুর পরী উদ্ভিন্নযৌবনা চিরকুমারী অপ্সরা, (আর বেঁচে থাকলে তো আছেই সাহসী যোদ্ধার বিশাল সম্মান আর পুরস্কার) - তারা হয়ত অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে এবং নিজেদের এই যুদ্ধাংদেহী জীন পরবর্তী প্রজন্মে বিস্তৃত করতে সহায়তা করেছে।

নিয়ে রিচার্ড ডকিন্সের একটি ভাল লেখা এ বইয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে - 'ধর্মের উপযোগিতা' শিরোনামে। দিগন্ত সরকারও তার একটি লেখায় এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন - ধর্মের উৎস সন্ধানে। 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছে?' - লেখাটির পাশাপাশি এ দুটো লেখাও পড়ে দেখা যেতে পারে।

মানব সভ্যতাকে অনেকে শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেন। শিশুদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয়। ধরা যাক একটা শিশু চুলায় হাত দিতে গেল, ওমনি তার মা বলে উঠল - *চুলায় হাত দেয় না - ওটা গরম!* শিশুটা সেটা শুনে আর হাত দিল না, বরং সাথে সাথে হাত সরিয়ে নিলো। মার কথা শুনতে হবে - এই বিশ্বাস পরম্পরায় আমরা বহন করি - নইলে যে আমরা টিকে থাকতে পারবো না, পারতাম না। এখন কথা হচ্ছে - সেই ভাল মাই যখন অসংখ্য ভাল উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেয় - শনিবার ছাগল বলি না দিলে অমঙ্গল হবে, কিংবা রসগোল্লা খেয়ে অংক পরীক্ষা দিতে যেও না - গেলে গোল্লা পাবে জাতীয় - তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দবিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। সব বিশ্বাস খারাপ নয়, কিন্তু অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস হয়ত অনেক সময় জন্ম দেয় 'বিশ্বাসের ভাইরাসের'। এগুলো একটা সময় প্রগতিকে থামাতে চায়, সভ্যতাকে ধ্বংস করে। যেমন, ডাইনী পোড়ানো, সতীদাহ, মুরতাদদের হত্যা এগুলোর কথা বলা যায়। রিচার্ড ডকিন্স, ডেনিয়েল ডেনেট প্রমুখেরা পশ্চিমে এ নিয়ে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ লিখছেন। অন্যান্য গবেষকদের মধ্যে আমেরিকান বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী জ্যারেড ডায়মন্ড আদিম সমাজে ধর্মকে একধরনের ডিলিনিয়েটর হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, ধর্ম আদিম সমাজে সম্ভবত এক ধরণের কৌশল যা যোগাযোগ রক্ষা কিংবা পরিচয়ের সূত্র খোঁজার জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ক্রমে এর সাথে যুক্ত হয়েছে পৌরহিত্য, পরলৌকিকতা এবং আরাধ্য দেবতার সন্তুষ্টি কামনার উদ্দেশ্যে নানা আয়োজন, যা এখনও বিশ্বজুড়ে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে টিকে আছে।

হিটলারকে যেভাবে এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে তার সাথে হয়ত অনেক পাঠকই একমত হবেন না। যদি ধরেও নেওয়া যায় লেখকের অনুমান সঠিক, তাহলেও এটি নিঃসন্দেহ যে, যুবক বয়েস থেকে হিটলারের মধ্যে গড়ে ওঠা ইহুদী-বিদ্বেষ কোন অলীক কল্পনাজাত বা নিজ-মস্তিষ্কপ্রসূত কিছু নয়। হিটলারের মধ্যে গড়ে উঠা ইহুদী-বিদ্বেষ নাস্তিক্যবাদের চেয়ে তদানীন্তন 'সভ্য' খ্রীষ্টান সমাজেরই অবদান। হিটলার নিজেই তার বই 'Mein Kampf' য়ে বলেছেন তার ইহুদি নিধনের কিংবা এ ধরনের যাবতীয় কাজকর্মের পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল স্বয়ং ঈশ্বর -

> "Hence today I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator: by defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord."

এ ধরণের বিশ্বাসের প্রচার হিটলার তার বিভিন্ন বক্তৃতায়ও করেছেন। হিটলারের একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করা যাক প্রাসঙ্গিক কিছু লাইন -

> "My feelings as a Christian points me to my Lord and Savior as a fighter. It points me to the man who once in loneliness, surrounded by a few followers, recognized these Jews for what they were and summoned men to fight against them and who, God's truth! was greatest not as a sufferer but as a fighter. In boundless love as a Christian and as a man I read through the passage which tells us how the Lord at last rose in His might and seized the scourge to drive out of the Temple the brood of vipers and adders. How terrific was His fight for the world against the Jewish poison. To-day, after two thousand years, with deepest emotion I recognize more

> profoundly than ever before the fact that it was for this that He had to shed His blood upon the Cross. As a Christian I have no duty to allow myself to be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice... And if there is anything which could demonstrate that we are acting rightly it is the distress that daily grows. For as a Christian I have also a duty to my own people.
>
> -Adolf Hitler, in a speech on 12 April 1922 (Norman H. Baynes, ed. *The Speeches of Adolf Hitler*, April 1922-August 1939, Vol. 1 of 2, pp. 19-20, Oxford University Press, 1942)

প্রোটেস্টেন্ট খ্রীষ্টান নেতা মার্টিন লুথারের ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষমূলক গ্রন্থ 'On the Jews and their Lies,'ও যে হিটলারকে দারুনভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল, তাও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। www.nobeliefs.com/hitler.htm - এই সাইটে হিটলারের খ্রীস্টিয় বিশ্বাস এবং অনুপ্রেরণা নিয়ে বেশ কিছু ভাল আলোচনা আছে।

খান মুহাম্মদের প্রবন্ধে 'সাধারণ মানুষের জন্য সমাজ একাঙ্গীকরণের চালিকা শক্তি হিসেবে এখনও ধর্মের বিকল্প নেই' বলে লেখক যে উপসংহার টানার চেষ্টা করেছেন তার সাথেও হয়ত অনেকেই একমত হবেন না না। একাঙ্গীকরণের ব্যাপারটা একই ধর্মের মানুষের জন্য হয়ত কিছুটা সত্যি, কিন্তু আলাদা ধর্মের মানুষের জন্য ততটাই মিথ্যা। পৃথিবীতে ধর্ম সব সময়ই ব্যবহৃত হয়েছে বিভেদের হাতিয়ার হিসেবে। এক ধর্মের অনুসারীদের সাথে অন্য ধর্মের রক্তাক্ত যুদ্ধের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। এমনকি একই ধর্মের ভিতরেও ব্রাহ্মণ-শূদ্র আর জাত-পাতের সমস্যা, আশরাফ-আতরাফ, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট কিংবা শিয়া-সুন্নী-কাদিয়ানী বিরোধ লেগেই আছে দিনভর। যতদিন ধর্ম থাকবে ততদিনই কিন্তু মানবতা জিনিসটা আলাদা আলাদা বিভিন্ন গোষ্ঠিতে বিভক্ত আকারেই থাকবে এটা অনেকেই মনে করেন।

'সাইকোসোমাটিক হলে আবার বিজ্ঞানের কাছে গিয়েও লাভ নেই' বলে প্রবন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে তাও সঠিক নয়। সাইকোসোমাটিক রোগীদের নিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিজ্ঞান বরং বৈজ্ঞানিকভাবেই সাইকোসোমাটিকিসমের উৎস নির্ণয় করতে সক্ষম। বিজ্ঞানের কাছে এটা মন বা মস্তিষ্কের একটা অবস্থা - তাই হতাশা কাটিয়ে ওঠার জন্য মস্তিষ্ক বা মনোবৈজ্ঞানিকের পরামর্শ নেওয়া অন্যায় নয়।

ধর্ম উধাও হওয়ার সাথে সাথে সমাজ থেকে নৈতিকতার মানদণ্ডও উধাও হয়ে যাবে বলে যে ঢালাও মন্তব্য করা হয়েছে তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং চীন সহ পৃথিবীতে অনেক জায়গায় ধর্ম এখন ক্রমবিলুপ্তির পথে, সেই সাথে কিন্তু মূল্যবোধ বা নৈতিকতা উধাও হয়ে যায় নি। নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মুলতঃ নির্ভর করে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। এ বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে যেগুলোতে পরিস্কার করা হয়েছে যে, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মোটেই ঈশ্বরপ্রদত্ত নয়, কিংবা ধর্ম থেকে উদ্ভুত নয়, বরং সমাজ বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবেই এটি মানব সমাজের ভিত্তিমূল হিসেবে গড়ে উঠেছে। নৈতিকতার মোড়কে পোড়া ধর্ম তো মানব সভ্যতার পুরো সময়টা ধরেই ছিল, কিন্তু ইতিহাসের পাতাগুলো অনৈতিক যুদ্ধ, অত্যাচার, বিভৎষতায় ভরা - ধর্ম সেগুলোকে কখনই ঠেকাতে পারেনি, অনেক ক্ষেত্রেই বরং উসকে দিয়েছে।

এ প্রবন্ধে আলোচিত কারণগুলোর বাইরে ধর্মের টিকে থাকার পেছনে অন্যান্য কারণও আছে। রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মকে বিচার না করলে কোন ধর্মের বিশ্লষণই বোধ হয় পূর্ণ হতে পারে না। এ ধরণের বিশ্লেষণ ছাড়া ধর্মকে ব্যখ্যা করতে গেলে সরলীকরণের সম্ভাবনা থেকে যায় অনেকাংশেই। গত দশ হাজার বছরের মানব ইতিহাস এবং বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস পড়লে এটা খুব সহজেই পরিস্কার হয়। মানব সভ্যতার বিভিন্ন ধাপে শুধু যে নতুন নতুন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে তাইই নয়, ক্রমাগতভাবে তাদের রূপও বদলেছে বিভিন্ন কারণে। এ অসম্পূর্ণতার ব্যাপারটা মেনে নিয়েও বলতে হয় খান মুহাম্মদের প্রবন্ধটি সময়োপযোগী এবং আমাদের জন্য চিন্তাভাবনার যথার্থ খোরাক।

খান মুহাম্মদ, বাংলাদেশের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি'র শিক্ষার্থী। 'শিক্ষানবিস' নামে ইন্টারনেটে ব্লগ লিখে থাকেন। ইমেইল - hermitage17@yahoo.com